আল্লাহ তাআলার সাথে মানুষের সম্পর্ক

অধ্যাপক গোলাম আযম

বইটির প্রসঙ্গকথা

জীবনে এমন মুহূর্তও আসে, যখন মানুষ অসহায়, নিরুপায় ও হতাশ অবস্থায় পড়ে যায়; এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের কোনো উপায় দেখতে পায় না। তখন কট্টর নাস্তিকও আল্লাহকে ডাকতে বাধ্য হয়। লঞ্চে ঝড়ের কবলে পড়ে সবাইকে আকুল হয়ে কাতরভাবে আল্লাহকে ডাকতে কয়েক বারই দেখেছি। কোনো সহায় না থাকলে যাকে সহায় মনে করে ডাকা হয় তিনিই তো আল্লাহ তাআলা।

এতে প্রমাণিত হয় যে, সব মানুষই আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক আছে বলে বুঝে; কিন্তু সম্পর্কের সঠিক ধরন সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা নেই। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক কেমন, তা সূরা নাস-এ জানিয়ে দিয়েছেন। এ বইটিতে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

যিনি আমাদেরকে পয়দা করেছেন, মৃত্যুর পর যাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে তাঁর সাথে সম্পর্কের বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকলেই তাঁর সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তা বুঝতে পারা সম্ভব। আশা করি, পুস্তিকাটি এ বিষয়ে আল্লাহর বান্দাহদের জন্য সহায়ক হবে। আল্লাহ তাআলা আমার এ আশা পূরণ করুন। আমীন!

গোলাম আযম
জেদ্দা, সৌদি আরব
২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ ঈসায়ী

সূচিপত্র

আল্লাহর পরিচয়
তিনটি নৈতিক সৃষ্টি
মানুষের পরিচয়
খিলাফতের দায়িত্ব কী
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছাড়া খিলাফতের দায়িত্ব পালন অসম্ভব
আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের ধরন
মানবসমাজে এত অশান্তি কেন?
মানুষের সাথে দয়াময় আল্লাহর আচরণ
আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অনুভূতি
আল্লাহর সাথে সম্পর্কের উচ্চতম মান
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার কর্মসূচি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তাআলার সাথে মানুষের সম্পর্ক

আল্লাহর পরিচয়

মহাবিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। কুরআন মাজীদে তাঁর আসল নাম 'আল্লাহ' বলে জানানো হয়েছে। তাঁর অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। তবে আসল নাম 'আল্লাহ'।

চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির মতো বিরাট বিরাট সৃষ্টির পাশাপাশি কীট-পতঙ্গের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। বিরাট হাতি ও ক্ষুদ্রতম জীবাণুও তাঁর সৃষ্টি। তিনি প্রতিটি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিধানও দান করেছেন।ীটষ্র মত্ূর্টলরণ বলে যাকিছু আছে, তাও একমাত্র তাঁরই সৃষ্ট।

গোটা সৃষ্টিজগতে এ কঠোর নিয়মের রাজত্ব কায়েম আছে। এসব নিয়ম বদলে দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। এসব নিয়ম যিনি তৈরি করেছেন, তিনি নিজেই তা চালু করেন। সকল সৃষ্টি ঐ নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। একমাত্র তিনিই সর্বশক্তিমান। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে যেটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন এর অতিরিক্ত ক্ষমতা কারো নেই।

আকাশ থেকে আওয়াজ দিয়ে আল্লাহ তাঁর এসব পরিচয় মানুষকে জানিয়ে দেননি। মানুষের মধ্যে তিনি যাঁদেরকে নবী ও রাসূল নিয়োগ দিয়েছেন, তাঁদের মাধ্যমে তিনি তাঁর পরিচয় জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষ তার চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে আল্লাহর এসব পরিচয় বুঝতে পেরেছে। বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে, সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে মানুষ যত তথ্য জানতে পেরেছে তাতে এসব সত্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে মানুষ উপলব্ধি করছে।

তিনটি নৈতিক সৃষ্টি

আল্লাহর সৃষ্ট জিনিসের মধ্যে কতক প্রাণহীন আর কতক জীবন্ত। জীবন্ত সৃষ্টির মধ্যে শুধু তিনটির নৈতিক চেতনা (ভালো-মন্দের ধারণা) আছে। ফেরেশতা, জিন ও মানুষ– এ তিনটি ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির মধ্যে নৈতিক চেতনা নেই।

ফেরেশতাদের ভালো ও মন্দ সম্পর্কে ধারণা থাকলেও কোনো মন্দ কাজ করার ইখতিয়ার তাদের নেই। তাই তাদের শাস্তি পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তারা আল্লাহর সকল আদেশ পালন করেন; কখনো অমান্য করতে পারেন না।

জিন ও মানুষের ভালো-মন্দ উভয় কাজ করারই ইখতিয়ার আছে বলে তাদের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি রয়েছে। ভালো কাজ করার ইখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও মন্দ কাজ করার ফলস্বরূপই শাস্তি পেতে হবে। আর মন্দ কাজ করার ইখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও ভালো কাজ করার ফলস্বরূপই পুরস্কার পাবে।

মানুষের পরিচয়

মানুষের দেহ আসল মানুষ নয়; আসল মানুষ হলো রূহ। দেহ বস্তুসত্তা, আর রূহ নৈতিক সত্তা। মায়ের পেটে দেহ তৈরি হওয়ার অনেক আগেই রূহকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ায় মানুষের যাকিছু করণীয় তা করার জন্য হাতিয়ার হিসেবেই দেহ দান করা হয়েছে। দেহের নৈতিক চেতনা নেই। অন্যান্য পশুর মতোই মানবদেহ নৈতিক চেতনাশূন্য।

ফেরেশতা নূর বা আলো দিয়ে তৈরি, জিন নার বা আগুন দিয়ে তৈরি, আর মানুষ মাটি থেকে সৃষ্ট। মাটি থেকে সৃষ্ট এ মানুষকেই আল্লাহ তাআলা খিলাফতের দায়িত্ব দিয়েছেন; এ দায়িত্ব ফেরেশতা ও জিনকে দেননি। তাই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব (আশরাফুল মাখলুকাত)-এর মর্যাদা পেয়েছে।

খিলাফতের দায়িত্ব কী

আল্লাহ একমাত্র মানুষকেই গোটা সৃষ্টিজগৎ ব্যবহার করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতে মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـ

‘তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।’

পৃথিবীর সবকিছু কাজে লাগানোর ইখতিয়ার শুধু মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। মানুষকে অন্য কোনো সৃষ্টির জন্য পয়দা করা হয়নি। তাই বিজ্ঞানের উন্নতি শুধু মানুষই করছে। জিন ও ফেরেশতা বিজ্ঞান চর্চা করে বলে জানা যায় না। সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা এবং সৃষ্ট সকল বস্তুকে ব্যবহার করার ক্ষমতা শুধু মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। আর এ ক্ষমতা প্রয়োগ করার হাতিয়ার হিসেবেই মানুষকে দেহযন্ত্রটি দান করা হয়েছে।

সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার জন্য সৃষ্ট বিধান মেনে চলতে বাধ্য করা হয়েছে এবং সেসব বিধান আল্লাহ নিজেই জারি করেন। ঐসব বিধান নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়নি; বিধানদাতা আল্লাহ সরাসরি তা চালু করেন।

কিন্তু মানুষের জন্য যে বিধান তিনি রচনা করেছেন, তা তিনি মানুষকে মানতে বাধ্য করেন না। অন্যান্য সৃষ্টির জন্য রচিত বিধানের মতো মানুষের জন্য রচিত বিধানও যদি আল্লাহ মানুষকে মানতে বাধ্য করতে চাইতেন তাহলে সে বিধান নবীর মাধ্যমে পাঠাতেন না। তিনি নিজে সে বিধান চালু না করে তাঁর পক্ষ থেকে মানুষকে তা জারি করার দায়িত্ব দিয়েছেন। এটিই খিলাফতের দায়িত্ব।

মানবদেহে আল্লাহ তাআলা চিন্তাশক্তি, বিবেচনাশক্তি, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি এবং বিপুল কর্মশক্তি দান করেছেন। এসব শক্তি ব্যবহার করার বিধানও তিনিই দিয়েছেন। দেহযন্ত্রটি ব্যবহার করে সৃষ্টিজগতের সবকিছুকে কাজে লাগানোর জন্যও প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান নবীর মাধ্যমে দান করেছেন। সেসব বিধান নবী শুধু পড়ে শুনিয়ে দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি বরং তিনি স্বয়ং ঐসব বিধি-বিধান বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এ কাজটিই খিলাফতের দায়িত্ব।

মুসলিম জাতি যতদিন এ দায়িত্ব পালন করেছে ততদিন বিশ্বে তাদেরই নেতৃত্ব কায়েম ছিল। এ দায়িত্বে অবহেলার ফলেই সংখ্যায় বিরাট হওয়া সত্ত্বেও তারা অপমানিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও বিপর্যস্ত।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছাড়া খিলাফতের দায়িত্ব পালন অসম্ভব

খিলাফতের দায়িত্ব একমাত্র তারাই পালন করতে সক্ষম, যারা আল্লাহর বিধানকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর শেখানো উপায়ে কায়েম করে। তাই আল্লাহর সাথে যাদের সম্পর্ক নেই তাদের পক্ষে ঐ দায়িত্ব কিছুতেই পালন করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্ক বহাল না থাকার কারণেই মানবজাতির নেতৃত্বের মর্যাদা থেকে মুসলিম জাতি বঞ্চিত হয়েছে। তাদের এ অধঃপতনের ফলে গোটা মানবজাতি আজ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার শিকারে পরিণত হয়েছে।

বিশ্বজগৎকে ব্যবহার করার যে ইখতিয়ার মানুষকে দেওয়া হয়েছে তা প্রয়োগ করে বর্তমান বিশ্বে যারা নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছেন, তারা তো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখার কোনো প্রয়োজনই বোধ করেন না। তাই সৃষ্টিজগতের উপর কর্তৃত্ব করার যে ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয়েছে তা মানবজাতির কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ক্ষমতা আল্লাহর মর্জির বদলে শয়তানের মর্জিমতোই ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই বিজ্ঞানের উন্নতি মানবজাতির জন্য আল্লাহর আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের ধরন

আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের ধরন কেমন তা তিনি স্বয়ং কুরআনের সর্বশেষ সূরা নাস-এ ঘোষণা করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, তিনি মানুষের রব, বাদশাহ ও ইলাহ।

যে আল্লাহকে বিশ্বাসই করে না আল্লাহ তারও রব, বাদশাহ ও ইলাহ; কিন্তু এ বিষয়ে তার চেতনা নেই। সম্পর্ক তো একতরফা হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, সে-ই শুধু এ সম্পর্কের মূল্য বোঝে এবং এর চেতনা অনুভব করে।

সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, মায়ের পেটে ভ্রূণ অবস্থা থেকে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তাকে লালন-পালন করছেন। রবের ইচ্ছা ছাড়া তার একটি নিঃশ্বাসও চলে না, হৃদয়ের স্পন্দন জারি থাকে না এবং কোনো একটি সেলও জীবিত থাকতে পারে না। জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্তার সামান্য ক্ষমতাও নেই। রব মানে লালন-পালনকারী ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতাশীল একমাত্র সত্তা আল্লাহ তাআলা।

আল্লাহ মানুষের বাদশাহ বা রাজা। এ বিশ্বে তাঁরই একচ্ছত্র রাজত্ব চলছে। অন্য কোনো সত্তা এতে শরীক নেই। তিনিই

নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক। তিনি একমাত্র রাজা, আর সকল মানুষ তাঁর প্রজা। আল্লাহর এ রাজত্ব থেকে পালানোর সাধ্যও কারো নেই।

সবাই সুখ-শান্তি চায়, অশান্তি কেউ-ই চায় না। সবাই যা চায় তা পায় না কেন? শান্তি দেওয়ার ক্ষমতা তো একমাত্র বাদশাহরই হাতে। শান্তি পেতে হলে বাদশাহ যা পছন্দ করেন তা-ই করতে হবে। তিনি অসন্তুষ্ট হন এমন কিছু করলে অশান্তি অনিবার্য। তাঁর রাজ্যে তাঁর দেওয়া বিধান মেনে চলা ছাড়া সুখ-শান্তি পাওয়া স্বাভাবিক হতে পারে না। পুষ্টি পাওয়ার নিয়তে বিষ খেলে কি বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?

আল্লাহ মানুষের একমাত্র ইলাহ। ইলাহ মানে হুকুমকর্তা প্রভু। তিনি যাদেরকে হুকুম দেওয়ার অধিকার ও দায়িত্ব দিয়েছেন, তারা কেউ প্রভু নয়। তাদের কারো আল্লাহর হুকুমের বিরোধী হুকুম করার অধিকার নেই। কেউ তেমন কোনো হুকুম দিলে তিনি তা অমান্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষের উপর হুকুম দেওয়ার ইখতিয়ার যাদেরকে দিয়েছেন, তাদের কারো এমন হুকুম দেওয়ার অধিকার নেই, যা তাঁর হুকুমের বিরোধী। তাই তিনিই একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু।

মানুষ যদি আল্লাহকে সচেতনভাবে রব, বাদশাহ ও ইলাহ হিসেবে মেনে চলে এবং তাঁকে অমান্য করা থেকে সতর্ক থাকতে সক্ষম হয়, তবেই তারা দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে সাফল্য লাভ করতে পারে।

মানবসমাজে এত অশান্তি কেন?

প্রাকৃতিক জগতে কোনো অশান্তি নেই। উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগতেও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। কারণ, তাদের জন্য স্রষ্টার রচিত বিধান তিনি স্বয়ং জারি করেন।

আমরা ছোট-বড় যত যন্ত্রপাতি ও মেশিনারি ব্যবহার করি, সেসব যারা তৈরি করেন তারা তা ব্যবহার করার বিধি-বিধান রচনা করে লিখিত আকারে যন্ত্রের সাথেই দিয়ে দেয়। প্রয়োজনে বিক্রেতা থেকে সেসব বিধি-বিধান ভালোভাবে বুঝে নিতে হয়। যদি ঐ বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় তবেই যন্ত্র থেকে প্রাপ্য সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হয়। ব্যবহারকালে ঐসব নিয়ম অমান্য করলে যন্ত্রটিই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনকি ব্যবহারকারী দুর্ঘটনার শিকারও হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে দেহযন্ত্রটি দিয়েছেন এর ব্যবহারবিধিও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। এ হাতিয়ারটি দিয়ে যে বিশ্বজগৎকে ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তা প্রয়োগ করার পদ্ধতিও তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন। নবীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানই সে শিক্ষার উৎস।

আকাশমণ্ডল, গ্রহজগৎ ও পৃথিবীর প্রকৃতিতে কোথাও অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না। আল্লাহ তাআলা মানুষের সুখ-শান্তির প্রয়োজনেই মাটি, পানি, বাতাস, আগুন ইত্যাদিকে ব্যবহারযোগ্য করে তৈরি করেছেন। বিশ্বের বাদশাহর রচিত বিধি-বিধান অনুযায়ী এসবই মানুষের সেবা করে চলেছে।

মানুষ যখন বাদশাহর অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন এক পর্যায়ে তিনি তাদেরকে দুনিয়াতেই শাস্তি দেন। সূরা আনআমের ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ ـ

'বলুন, তাঁর এ ক্ষমতা আছে যে, তোমাদের উপর আযাব নাযিল করে দিতে পারেন, তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে।'

আল্লাহ যখন শাস্তি দেওয়ার ফায়সালা করেন, তখন এর জন্য বিরাট কোনো আয়োজন করার দরকার হয় না। তিনি যে মাটি, পানি, বাতাস ও আগুনকে মানবসেবায় লাগিয়ে রেখেছেন, সেসবকেই আযাবের মাধ্যম বানিয়ে নেন। ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, সিডর অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি ঘটিয়ে এক মুহূর্তে বিরাট জনপদ ধ্বংস করে দিতে পারেন। এসবকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই।

সূরা রূমের ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ ـ

‘এই যে জলে-স্থলে ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) ছড়িয়ে পড়েছে, এ সবই মানুষের হাতের কামাই।’

আল্লাহ তো মানুষের সেবা করার জন্যই মাটি, পানি, বাতাস ও আগুনকে নিয়োগ করেছেন; কিন্তু মানুষের দুষ্কর্মের পরিণামে আল্লাহর আশীর্বাদই অভিশাপে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ মানুষের উপর যুলুম করেন না। মানুষ নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম চাপিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মানুষ নিজেদের উপর বিপদ ডেকে আনে।

মানুষের সাথে দয়াময় আল্লাহর আচরণ

মানুষের সাথে আল্লাহর তিন ধরনের সম্পর্কের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম নিজেকে তাদের স্নেহপরায়ণ রব হিসেবেই পরিচয় দিয়েছেন। রাসূল (স)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীর প্রথম কথাটিতে তিনি নিজেকে ‘রব’ বলেই তুলে ধরেছেন–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ

‘পড়ুন, আপনার ঐ রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।’

কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম পরিপূর্ণ সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতেও তিনি নিজেকে ‘রাব্বুল আলামীন’ হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে যত দু‘আ দিয়েছেন তাতে ‘রাব্বানা’ বলে সম্বোধন করার ব্যবস্থা করেছেন। হাদীসের দু‘আ শুরু হয় ‘আল্লাহুম্মা’ বলে, আর কুরআনে ‘রাব্বানা’ বলে।

নামাযে রুকু’ হলো আল্লাহর নিকট নত হওয়া, আর সিজদা হলো আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। এ দু জায়গায় তাসবীহ পড়ার জন্য রাসূল (স) যে শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে আল্লাহকে ‘আমার রব’ বলতে শিখিয়েছেন। আল্লাহ তো রাব্বুল আলামীন। ‘আমার রব’ বললে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বোঝায় বলেই তিনি এ শিক্ষা দিয়েছেন।

দয়াময় আল্লাহ যে কত স্নেহপরায়ণ তা এসব আচরণ থেকে অনুভব করা যায়।

আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অনুভূতি

মা সকল সন্তানকেই আদর-স্নেহ করেন। সবাই মায়ের স্নেহধন্য হওয়ার কথা। কিন্তু স্নেহধন্য হওয়ার অনুভূতি সবার এক সমান নয়। অনুভূতিতে যে যত গভীর সে ততটাই তৃপ্তিবোধ করে এবং মায়ের প্রতি তার ভালোবাসা বেড়ে যেতে থাকে। এমন বেপরওয়া ছেলেও থাকে, যে মায়ের মর্যাদা বুঝে না, মায়ের স্নেহের মূল্যায়ন করে না এবং মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা করে।

আল্লাহ তাআলা সকল মানুষেরই রব, বাদশাহ ও ইলাহ। অনেকের এ ব্যাপারে সামান্য চেতনাও নেই। যাদের ঈমান আছে তাদেরও এ বিষয়ে অনুভূতি এক রকম নয়। তাদের কতক এ সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা রাখে বটে কিন্তু আবেগ অনুভব করে না। এ ধরনের লোকেরা নামায-রোযা করলেও আল্লাহর সাথে সম্পর্কের স্বাদ অনুভব করে না।

সূরা বাকারার ১৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ـ

‘যারা ঈমানদার, আল্লাহর জন্য তাদের ভালোবাসা সবচেয়ে গভীর।’

ভালোবাসা মানেই আবেগপূর্ণ সম্পর্ক। আল্লাহর সাথে ভালোবাসার প্রকৃত অনুভূতি যাদের আছে, তারা যাকিছু করে সচেতনভাবে তা আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী করতে চেষ্টা করে। তারা আল্লাহর হুকুম পালন করার মধ্যে তৃপ্তি ও স্বাদ অনুভব করে।

এ জাতীয় লোকেরা আল্লাহকে রব হিসেবে এমন গভীর অনুভূতির সাথে স্মরণ করে, যার ফলে তারা পূর্ণ নিরাপত্তাবোধ করে। তাদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তাদের রব যা-ই করেন তাতেই মঙ্গল রয়েছে। আপদ-বিপদকে তারা রবের পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে প্রশান্তির সাথে ধৈর্যধারণ করে। এমন কিছু করে না যা চিত্তের অস্থিরতার পরিচায়ক। তারা পেরেশান হয় না; মেহেরবান রব থেকে নিরাশ হয় না।

এ ধরনের মানুষ আল্লাহকে তাদের বাদশাহ হিসেবে অনুভব করে এবং তাঁর প্রজা হিসেবে গৌরববোধ করে। বাদশাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো কাজ করা থেকে সতর্ক থাকে। কোনো ত্রুটি হয়ে গেলে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে।

নিজেকে আল্লাহর সৈনিক মনে করে। আল্লাহর রাজ্যে যা মন্দ, তা দূর করার চেষ্টা করে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শক্তিকে ভয় করে না। সাধ্যে যতটুকু কুলায়, চেষ্টা করতে থাকে। যাতে আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা মানবসমাজে চালু করা যায় এবং যা তিনি অপছন্দ করেন তা থেকে সমাজকে রক্ষা করা যায়। আল্লাহর সৈনিকের অনুভূতির ফলে এ জাতীয় মানুষ একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে।

যারা এ মানের মানুষ, তারা আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র ইলাহ বা হুকুমকর্তা প্রভু বলে মান্য করে এবং তাঁর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম পালন করে না। কোনো লোভ বা ভয় দেখিয়ে তাদেরকে এ নীতি থেকে সরানো যায় না।

আল্লাহর সাথে সম্পর্কের যথার্থ চেতনা ও অনুভূতিই ঐ রক্ষাকবচ, যা মানুষকে সকল অবস্থায় শয়তানের প্রতারণা, পরিবেশের চাপ এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম।

আল্লাহর সাথে সম্পর্কের উচ্চতম মান

আল্লাহর সাথে রব, বাদশাহ ও ইলাহ হিসেবে সম্পর্কের আবেগপূর্ণ অনুভূতি নিয়ে যারা নিষ্ঠার সাথে জীবন যাপন করতে থাকেন, তারা এক সময় এমন উচ্চ মানে পৌঁছেন, যখন আল্লাহর সাথে আরো একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আল্লাহ তখন তাদের ওলী হয়ে যান। সূরা বাকারার ২৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ

'আল্লাহ তাদেরই ওলী, যারা ঈমান এনেছে।'

وَلِىٌّ ওলী শব্দের অর্থ– বন্ধু, সাহায্যকারী, অভিভাবক। সূরা ইউনুসের ৬২ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ ؕ

এ আয়াতে 'ওলী' শব্দটি মানুষের জন্যও ব্যবহার করে বলা হয়েছে, 'জেনে রাখো, আল্লাহর ওলীদের ভয় করার কিছু নেই এবং তাদেরকে হতাশও হতে হবে না'।

'ওলী' শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হয় 'অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক'। আর মানুষের জন্য যখন ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় 'অতি আদরের দাস'। আল্লাহ পরম স্নেহপরায়ণ প্রভু, আর মুমিন অত্যন্ত স্নেহভাজন দাস বা পরম স্নেহের পাত্র।

মানুষের মধ্যে কে আল্লাহর ওলী তা একমাত্র তিনিই জানেন। কোনো মানুষকে আল্লাহর ওলী বলে প্রচার করা উচিত নয়। কারণ, এ বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সঠিক জ্ঞান নেই।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার কর্মসূচি

আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অনুভূতি সম্বন্ধে যা লেখা হলো তা অর্জনের জন্য যারা নিষ্ঠার সাথে সাধনা করতে থাকে তারাই তা হাসিল করতে সফল হতে পারে। যারা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনে দায়িত্বশীল, তাদের জন্য এ সাধনা করা অত্যন্ত জরুরি। দায়িত্বশীল বললে শুধু উপরের নেতাই বোঝায় না; সংগঠনের ইউনিট পরিচালকও দায়িত্বশীল।

আল্লাহর দীন শুধু তাদের হাতেই বিজয়ী হতে পারে, যাদের জীবনে দীন বিজয়ী। জীবনে দীনকে বিজয়ী করতে হলে আল্লাহ তাআলার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতেই হবে। এ বিষয়ে যারা আগ্রহী তাদেরকে নিম্নরূপ কর্মসূচি পালন করতে হবে :

১. জীবনের আসল লক্ষ্য স্থির করতে হবে। আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার চেষ্টাকেই আসল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আয়-রোজগার ও ঘর-সংসার করতে হবে বটে কিন্তু বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হতে হবে দীনের বিজয়ের চেষ্টা।

২. সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলনকে অন্য সকল ভালোবাসার পাত্র থেকে বেশি ভালোবাসতে হবে এবং বাস্তব জীবনে এর দাবি পূরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

৩. পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে জামাআতে নামায আদায় করতে হবে। নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকার বাইরে অন্য কিছুই করা যায় না। নামাযের এ শিক্ষাকে নামাযের বাইরের জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। দুনিয়ার সকল কাজই আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী সমাধা করার সাধনা করতে হবে।

৪. একমাত্র হালাল উপায়ে আয়-রোজগার করতে হবে এবং তা থেকে আল্লাহর ব্যাংকে আখিরাতের পুঁজি জমা করতে হবে। হালাল পথে যা খরচ করা হয় তাও সাদাকাহ হিসেবে গণ্য। বিবি-বাচ্চার প্রয়োজন পূরণে যা খরচ করা হয় তাও সাদাকাহ। তবে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যত বেশি পরিমাণ খরচ করা যায়, তা সরাসরি আল্লাহর তহবিলে জমা হয় এবং আখিরাতের পুঁজি হিসেবে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৫. যাকিছু করা হয় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে সাফল্যের নিয়তে করতে হবে। নিয়তের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে। নিয়তে ত্রুটি থাকলে কোনো নেক আমলই কবুল হয় না।

এ পাঁচটি মূলনীতি মেনে চলতে থাকলে এবং আল্লাহর সাথে ঐ তিন প্রকার সম্পর্কের চেতনা জাগ্রত রাখলে আশা করা যায় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণই লাভ করা সম্ভব হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

সমাপ্ত